بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

# খুতবা জুম'আ

## ক্ষমার পরম মার্গ আমরা মহানবী (সা.)-এর জীবনে দেখতে পাই। মহানবী (সা.)-এর মার্জনার অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে আর তার ক্ষমা এমন সুমহান পর্যায়ে উন্নত যে, তা দেখে মানুষ হতভম্ব হয়।

**সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার**

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এক উপলক্ষ্যে বলেন, প্রকৃত মু'মিন সে-ই যে নিজের জন্য যা চায় নিজ ভাইয়ের জন্যওতা-ই পছন্দ করে। এটি এমন এক সোনালী নীতি যা পৃথিবীর সর্বস্তরে, ঘর থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার ভীত রচনা করে, ঝগড়া বিবাদের অবসান ঘটায়, হৃদয়ে নম্রতা সৃষ্টি করে, একে অপরের প্রাপ্য প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। আমি বেশ কয়েকবারঅন্যদের সামনে যখন এ কথা তুলে ধরি তখন তারা এতে খুবই প্রভাবিত হয়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য শুধু ভালো কথা বলে মানুষকে প্রভাবিত করা নয় বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো নিজেদের কর্মের মাধ্যমে এ কথার এবং সকল ইসলামী নির্দেশের সৌন্দর্য প্রমাণ করা। নতুবা কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, খুব ভালো কথা, কিন্তু এটি বল যে, তোমাদের মাঝে কতজন এ কথা মেনে চলে, যখন সুযোগ হয় তখন কতজন এমন আছে যারা স্বার্থপরতা প্রদর্শন করে না? কোন কথার সৌন্দর্য তখনই প্রকাশ পায় যখন যিনি সেই কথা বলেন তিনি তা মেনেও চলেন। মানুষ তখনই আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে পারবে যখন আমাদের কথা এবং কর্ম এক হবে। মানুষ শুধু কথা শোনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তারা আমাদেরকে দেখেও থাকে বা আমাদের ওপর তাদের দৃষ্টিও থাকে।

অতএব ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে যখন আমরা কোন শিক্ষা বা নির্দেশ বা এই প্রেক্ষাপটে উন্নত নৈতিক চরিত্রের কথা বলি তখন অ-আহমদীরা বা অ-মুসলিমরা আমাদেরকে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখেও থাকে যে, তাদের নিজেদের আমল কেমন। কেউ এটি অস্বীকার করতে পারে না যে, মহানবী (সা.) মু'মিনের উন্নত নৈতিক চরিত্রের জন্য যে শিক্ষা দিয়েছেন তাহলো, তোমাদের প্রকৃত মু'মিন হওয়ার পরিচয় তখন পাওয়া যাবে যখন তোমাদের চারিত্রিক গুণাবলীও উন্নত হবে এবংএকে অপরের প্রতিতোমাদের আবেগ অনুভূতির মানওউন্নত হবে। আর সেই মান কি? সেই মান হলো যা নিজের জন্য পছন্দ কর অন্যদের জন্যও তা-ই পছন্দ কর। এটি হওয়া উচিত নয় যে, নিজের অধিকারের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের ধ্বনী উচ্চোকিত করতে থাকবেআর অন্যদের অধিকার প্রদানের সময় নেতিবাচক আচরণ প্রদর্শন করবে। সুতরাং নিজেদের অধিকার হস্তগত করার জন্য আমরা যেভাবে ব্যকুল হয়ে যাই অন্যের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রেওআমাদের একই মানদন্ডে উপনীতহওয়া উচিত। আমাদের দ্বারা কোন ভুল হলে আমরা যখন চাই যে, আমাদের ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেয়া হোক এবং আমাদেরকে যেন ধরপাকড় না করা হয়, আমাদেরকে যেন শাস্তি দেয়া না হয় অনুরূপভাবে অন্য কেউ যখন কোন ভুল করে যার কারণে আমরাও প্রভাবিত হই, এমন ক্ষেত্রে যদি সেঅভ্যস্ত অপরাধী না হয় এবং যদি বারবার ভুল বা অন্যায় না করে, তাহলে তার সাথেও আমাদের সেই ব্যবহারই করা উচিত অর্থাৎ ক্ষমা করা উচিত। অবশ্য যদি কোন ভুল বা ভ্রান্তির কারণে জামাত বা জাতিগত স্বার্থের হানি হয় তাহলে এটি তখন ব্যক্তিগত ভুল বা ভ্রান্তি থাকে না বরং জাতিগত অপরাধে পর্যবসিত হয়,আর তখন এমন লোকদের সম্পর্কে সিদ্ধান্তও কোন ব্যক্তি নয় বরং প্রতিষ্ঠান করে।

যাহোক আমি এ কথা বলছি যে, সমাজের দৈনন্দিন পারস্পরিক বিষয়াদির ক্ষেত্রেও আমরা যেখানে মনে করি যে, এটি আমার অধিকার, এখন প্রশ্ন হলো আমরা অন্যদেরওসেই অধিকার প্রদান করি কিনা বা অন্যদের সেই অধিকার দেওয়ার মনমানসিকতা আমাদের আছে কিনা। আর এই ক্ষেত্রেমৌলিক একক হলো ঘর, বন্ধু পরিমহল, ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। যখন ক্ষুদ্র পরিসরে বা নিজের ক্ষুদ্র গন্ডিতে এই চিন্তা চেতনা থাকবে তখন সমাজের বৃহত্তর গন্ডিতেও এই চিন্তা চেতনার বিস্তার ঘটবে, স্বার্থপরতার অবসান হবে, অন্যের অধিকার দেয়ার কথা বেশি হবে, ক্ষমা করার প্রবণতা বাড়বে এবং শাস্তি দেয়া বা শাস্তি পাওয়ানোর প্রতি মনোযোগ কম নিবদ্ধ হবে। আর আল্লাহ্ তা'লা কুরআন

শরীফেও বাহ্যিক অধিকার এবং চাহিদার ব্যাপারে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি ক্ষমার মনমানসিকতা সৃষ্টি করার প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ
وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

(সূরা আলে ইমরান: ১৩৫)

অর্থাৎ যারা স্বাচ্ছন্দেও খরচ করে এবং অস্বাচ্ছন্দেও খরচ করে, আর ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে মার্জনা করে, আর আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহশীলদের ভালোবাসেন।

অতএব এখানে প্রথমত আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সেসব বান্দার অধিকার আদায়ের জন্য খরচ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যারা অভাবী। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মোহসেন বা সৎকর্মশীলদের আরেকটি লক্ষণ হলো তারা নিজেদের আবেগ অনুভূতিকেও নিয়ন্ত্রণে রাখে। এটি অনেক বড় বিষয় যে, রাগও হবে না আর প্রতিশোধ প্রবণতাও মন থেকে বেরিয়ে যাবে।আর শুধু এটিই নয় যে, প্রতিশোধ প্রবণতাকে মন থেকে উৎপাটন করা হবে বরং যে ভুল করে তার ওপর কিছুটা এহ্সানও যেন করা হয়, এটি অনেক বড় একটি বিষয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা চান মু'মিনদের ভিতর যেন এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়।

ইসলামের ইতিহাসে হযরত হাসানের একটি ঘটনা পাওয়া যায় যে, একবার তার এক কৃতদাস কোন ভুল করে যার ফলে তাঁর অত্যধিক রাগ হয় আর তিনি তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হন। তখন সেই কৃতদাস আয়াতের এই অংশ পড়েন যে, وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ অর্থাৎ পুণ্যবানরা তো ক্রোধ সংবরণ করে। এটি শুনে হযরত হাসান শাস্তি দেওয়ার জন্য যে হাত উঠিয়েছিলেন তা নিচে নামিয়ে নেন এবং হাত উঠাননি। এতে সেই কৃতদাস আরো সাহসী হয়ে উঠে এবং বলে, وَالْعَافِيْنَ অর্থাৎ এমন পুণ্যবানরা মানুষকে ক্ষমা বা মার্জনাও করে। তখন হযরত হাসান আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী বলেন, যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। এটি শুনে সেই দাস আরো সাহসী হয়ে উঠে এবং বলে, وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এহ্সানকারীদের বা অনুগ্রহশীলদের ভালোবাসেন। তখন তিনি সেই কৃতদাসকে বলেন যে, যাও তোমাকে আমি মুক্ত করলাম, তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। অতএব যারা খোদার ভালোবাসা লাভ করতে চায় এবং আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন করে, এই হলো তাদের আচার ব্যবহার যে, তারা শুধু দোষী ব্যক্তির দোষ ক্ষমাই করে না তারা বরং তাদের ওপর এহ্সান বা অনুগ্রহও করে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে এক জায়গায় বলেন, স্মরণ রেখ যে ব্যক্তি কঠোর ব্যবহার করে এবং ক্ষেপে যায় তার মুখ বা জিহ্বা থেকে আদৌ তত্ত্বজ্ঞান এবং প্রজ্ঞার কথা নিঃসৃত হতে পারে না। সেই হৃদয়কে হিকমতের কথা থেকে বঞ্চিত করা হয় যে নিজ প্রতিদ্বন্দীর সামনে দ্রুত ক্ষেপে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। যে ব্যক্তি নোংরা এবং নিয়ন্ত্রণহীনকথা বলে তার বিবেক বুদ্ধিকে সূক্ষ্ম চিন্তাধারা থেকে বঞ্চিত করা হয়। তিনি বলেন, ক্রোধ এবং প্রজ্ঞা এক জায়গায় একত্রিত হতে পারে না। যে ক্রোধের সামনে পরাস্ত হয় তার বিবেক বুদ্ধি মোটা এবং অজ্ঞ হয়ে থাকে এবং কোন ময়দান বা ক্ষেত্রে তাকে বিজয় এবং সাহায্য প্রদান করা হয় না।ক্রোধ বা রাগ অর্ধেক উন্মাদনার সমান। এটি সীমা ছাড়িয়ে গেলে পুরো উন্মাদনায় পর্যবসিত হতে পারে। তিনি আরো বলেন, স্মরণ রেখ বিবেক-বুদ্ধি এবং রাগ ও ক্রোধের মাঝে এক শত্রুতা বিদ্যমান। তিনি বলেন যখন রাগ হয় তখন বিবেক-বুদ্ধি ঠিক থাকতে পারে না। কিন্তু যে ধৈর্য্য ধারণ করে এবং সহনশীলতা প্রদর্শন করে তাকে এক আলো বা জ্যোতি প্রদান করা হয় যার ফলে তার বিবেক-বুদ্ধি এবং চিন্তা-শক্তিতে এক নব আলো সৃষ্টি হয়ে যায় আর এরপর সেই আলো থেকে আরো আলোর জন্ম হয়। রাগ বা ক্রোধের অবস্থায় মন-মস্তিষ্ক যেহেতু তমসাচ্ছন্ন থাকে তাই অন্ধকার থেকে অন্ধকারেরই জন্ম হয় বা অমানিসা থেকে অমানিসাই উদ্ভুত হয়।

অনেক সময় কঠোরতাও প্রদর্শন করতে হয়। কিন্তু রাগের বশবর্তী হয়ে বা ক্রোধের বশীভূত হয়ে কঠোরতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। ইসলামে শাস্তির দৃষ্টিভঙ্গী বা শাস্তি দেওয়ার শিক্ষাও রয়েছে। কিন্তু এর জন্য কিছু নিয়ম এবং নীতি নির্ধারিত আছে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে শাস্তি দেওয়া মানুষকে হিকমত বা প্রজ্ঞা থেকে দূরে ঠেলে দেয় এবং ন্যায় বিচার থেকে দূরে নিয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে রাগ এবং ক্রোধ সংবরণের পর ক্ষমা করার যে শিক্ষা দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে তিনি প্রজ্ঞাশূন্য ভাবেই বলে দেননি যে, ক্ষমা করতে থাক, বরং ক্ষমা এবং শাস্তির হিকমত উল্লেখ করে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন। অতএব

আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ○ (সূরা আশ্-শূরা: ৪১)

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا অর্থাৎ অন্যায়ের শাস্তি যতটা অন্যায় করা হয় সে অনুপাতে হয়ে থাকে। অতএব যে কেউ ক্ষমা করে আর এর উদ্দেশ্য সংশোধন হয়ে থাকে, তাহলে তার প্রতিদান বা পুরস্কার আল্লাহ্র হাতে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

অতএব মূল বিষয় হলো অপরাধীকে তার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন করে সংশোধন করা, এটি নয় যে, প্রতিশোধ নেওয়া বা মামলায় জড়ানো অথবা নিজের সম্পদ নষ্ট করা বা অন্যের সম্পদও নষ্ট করা বা নিজের ও অন্যের সময় নষ্ট করা এবং জামাতী প্রতিষ্ঠানের হাতে যদি বিষয় থাকে তাহলে জামাতের বিরুদ্ধে কুধারণা করা আসল উদ্দেশ্য। যদি ক্ষমা করার ফলে সংশোধন হয় তাহলে ক্ষমা করা উচিত। আর যদি সংশোধনের জন্য শাস্তি দেওয়া আবশ্যক হয় তাহলে প্রজ্ঞার দাবি হলো যেন শাস্তি দেয়া হয়। আর এরপর নিঃসন্দেহে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত বিষয় নিয়ে যাওয়া উচিত।

ন্যায় বিচারের আইন অনুসারে অপরাধ অনুপাতে শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি নিজের অপরাধীকে এই শর্তের অধীনে ক্ষমা করে যে, সেই ক্ষমার ফলে অপরাধীর সংশোধন হবে, এমন নয় যে, এর ফলে সে অপরাধের ক্ষেত্রে আরো ধৃষ্ট হয়ে উঠবে, তাহলে এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার নিকট বড় পুরস্কার পাবে।

অতএব মার্জনা এবং ক্ষমা তখন করতে হয় যখন অপরাধীর আচরণ স্পষ্ট হয় অর্থাৎ বোঝা যায় যে, ভবিষ্যতে সে আর এই অন্যায় কাজ করবে না। অনেকেই কমিটেড/অভ্যস্ত অপরাধী হয়ে থাকে/অভ্যস্ত হয়ে থাকে অপরাধে আর প্রত্যেকবার অপরাধ করে সে ক্ষমা চায়। এমন লোকদের জন্য শাস্তি আবশ্যক। আর শাস্তিও এমন হওয়া উচিত যার ফলে সংশোধনের দিকটা সামনে আসে। অতএব এই হলো ইসলামী শাস্তি এবং ক্ষমার প্রজ্ঞা বা হিকমত যে, সংশোধন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। চোখ বন্ধ করে সবাইকে ক্ষমা করা হবে এটিও আল্লাহ্ তা'লা চান না। আর রাগের বা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে শাস্তি দেয়ার মনমানসিকতাও সবসময় প্রকাশ করা হবে এটিও আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন না। ক্ষমা করতে থাকলেও সমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয় আর চোখ বন্ধ করে শাস্তি দিতে থাকলেও হিংসা এবং বিদ্বেষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর সমাজে ঘৃণার পাচিল গড়ে উঠতে থাকে এবং অশান্তির বিস্তার ঘটতে থাকে।

যাহোক এটি তো ইসলামের একটি নীতিগত শিক্ষা। এখন আমরা দেখি যে, মহানবী (সা.) কতটা ক্ষমা করতেন আর সাহাবীদের এ সম্পর্কে কি শিক্ষা তিনি দিয়েছেন। ক্ষমার পরম মার্গ আমরা মহানবী (সা.)-এর জীবনে দেখতে পাই যে, যাদের শাস্তির সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল তিনি (সা.) তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন। অন্য কারো বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছে তাকে ক্ষমা করেননি বরং তার বিরুদ্ধে যারা অপরাধ করেছে তার সন্তানদের হত্যাকারীদের তিনি ক্ষমা করেছেন। কেননা তাদের সংশোধন হয়ে গিয়েছিল। হাদীসের ঘটনা আমরা দেখতে পাই যে, এক ব্যক্তি হাব্বার বিন আসওয়াদ রসূলে করীম (সা.)-এর দৌহিতা হযরত যায়নাব এর ওপর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পথে বর্শার আক্রমণ হানে। তিনি তখন অন্তঃসত্তা ছিলেন। আক্রমণের কারণে তার গর্ভপাত হয়, তিনি আহত হন/আঘাত পান আর এর ফলে তিনি ইন্তেকালও করেন। এই অপরাধের কারণে হাব্বারের বিরুদ্ধে হত্যার সিদ্ধান্ত হয়। মক্কা বিজয়ের সময় এই ব্যক্তি কোথাও পালিয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে মহানবী (সা.) যখন মদীনা ফিরে আসেন তখন হাব্বার মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয় এবং বলে যে, আমি করুণা ভিক্ষা চাচ্ছি। প্রথমে আপনার ভয়ে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার মার্জনা এবং দয়া আমাকে ফিরিয়ে এনেছে। হে আল্লাহ্র নবী! আমরা অজ্ঞ ছিলাম, আমরা ছিলাম মুশরিক। খোদা তা'লা আপনার মাধ্যমে আমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন আর ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আমি আমার সীমালঙ্ঘন স্বীকার করছি সুতরাং আমার অজ্ঞতাকে আপনি মার্জনার দৃষ্টিতে দেখুন। আর ক্ষমা করুন। অতএব মহানবী (সা.) তার কন্যার এই হত্যাকারীকে ক্ষমা করেন। এবং বলেন যে, যা হে হাব্বার! আমি তোকে ক্ষমা করলাম। এরপর বলেন যে, খোদার এটি এহসান এবং অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাকে ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন। অতএব তিনি যখন দেখেছেন যে, সংশোধন হয়ে গেছে তখন তিনি নিজের কন্যার হত্যাকারীকেও ক্ষমা করেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, রসূলে করীম (সা.) তার বিরুদ্ধে যত অপরাধ করা হয়েছে কোন অপরাধের কখনো প্রতিশোধ নেননি। এক ইহুদী মহিলা তিনি কখনো খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল, তিনি তাকেও ক্ষমা করে দেন অথচ কোন কোন সাহাবীর ওপর সেই বিষের প্রভাবও পড়েছিল। এছাড়া উহুদের যুদ্ধে যে হিন্দা মহানবী (সা.) এর চাচা হযরত হামযার অঙ্গচ্ছেদ করেছিল, তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলেছিল, কান, নাক ইত্যাদি কেটে ফেলেছিল এবং কলিজা বের করে চিবিয়েছিল, মক্কা বিজয়ের সময় অন্যান্য মহিলাদের সাথে মিশে সে বয়আত করে নেয়। তার কোন কোন প্রশ্ন শুনে মহানবী (সা.) তাকে চিনে যান এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা। সে

বলে যে, হ্যাঁ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি এখন আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছি। পূর্বে যা ঘটে গেছে তা মার্জনা করুন। মহানবী (সা.) হিন্দাকে ক্ষমা করেন। হিন্দার ওপর তার মার্জনার এমন সুগভীর প্রভাব পড়ে যে, তার জীবন পুরোপুরি বদলে যায়। গভীর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা তার হৃদয়ে ঘর করে। বরং সেদিন সন্ধ্যায়-ই সে মহানবী (সা.)-কে দাওয়াত করে এবং দু'টি ছাগল রোস্ট করে পাঠিয়ে দেয় খাবার জন্য এবং একই সাথে এটিও বলে যে, আজকাল পশুর অভাব রয়েছে তাই শুধু দু'টোই পাঠালাম। এতে মহানবী (সা.) দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি হিন্দার পশু পালে অনেক বরকত দাও। অতএব বলা হয় যে, এই দোয়ার ফলে এমন বরকত সৃষ্টি হয়েছে যে, তার পশুপাল নিয়ন্ত্রণ করা তার জন্য সম্ভব হতো না (অর্থাৎ এত বেশি বরকত হয়)।

আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের ঘটনা সবাই জানে যে মুনাফিকদের সর্দার ছিল। তার সমস্ত ধৃষ্টতা আর অবমাননা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করেন আর শুধু তাই নয় তার জানাযাও পড়ান। কাব বিন জাহির এক সুপরিচিত/বিখ্যাত কবি ছিল। কোন কারণে তার জন্যও শাস্তির সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। মক্কা বিজয়ের পর তার ভাই লিখেছে তাকে যে, এখন এসে মহানবী (সা.)-এর কাছে ক্ষমা চাও। অতএব সে মদিনা আসে এবং তার এক পরিচিত ব্যক্তির কাছে আশ্রয় নেয় আর মহানবী (সা.)-এর পিছনে ফজরের নামায পড়ে। নামাযের পর রসূলে করীম (সা.)-এর দরবারে নিবেদন করে যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল কাব বিন জাহির তওবার জন্য এসেছে আর ক্ষমা চাচ্ছে আপনার কাছে। তিনি (সা.) তাকে চেহারায় চিনতেন না। তাই সে ব্যক্তি বলে যে, যদি অনুমতি হয় তাকে আপনার দরবারে উপস্থিত করা যেতে পারে। তিনি (সা.) বলেন যে, হ্যাঁ তাকে সামনে নিয়ে আসা হোক। সেই ব্যক্তি তখন বলেন যে,হে আল্লাহ্‌র রসূল আমিই কাব বিন জাহির। তখন এক আনসারী তার সম্পর্কে যেহেতু হত্যার সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছিল সেই কারণে সেই আনসারী তাকে হত্যার জন্য দন্ডায়মান হয়, তখন মহানবী (সা.) বলেন যে, এ ক্ষমার আবেদন নিয়ে এসেছে তাকে ক্ষমা কর। তখন রসূলে করীম (সা.)-এর দরবারে সেই ব্যক্তি একটি কাসীদা/কবিতা উপস্থাপন করে/পরিবেশন করে। মহানবী (সা.) এতে তার আনন্দের/সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তাকে চাদর পরিয়ে দেন। এই ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা.) ক্ষমার মান, শুধু ক্ষমাই করতেন না বরং পুরস্কৃত করে, দোয়া দিয়ে বিদায় দিতেন। মহানবী (সা.)-এর মার্জনার অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে আর তার ক্ষমা এমন সুমহান পর্যায়ে উন্নত যে, তা দেখে মানুষ হতভম্ব হয়।

একবার এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে বলে যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল আমার এক কৃতদাস রয়েছে যে অন্যায় কাজ করে, আমি কি তাকে দৈহিক শাস্তি দিতে পারি। রসূলে করীম (সা.) বলেন, তুমি তাকে প্রতিদিন ৭০বার ক্ষমা কর। অর্থাৎ অগণিত বার তাকে ক্ষমা কর।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে,জামাত প্রস্তুত করা বা গঠন করার উদ্দেশ্য হলো মুখ চোখ কান নাক এবং সকল অঙ্গের মাধ্যমে যেন তাকওয়া প্রবেশ করে, তাকওয়ার আলো যেন তার ভিতরে এবং বাহিরেও দেখা যায়। উন্নত চরিত্রের মহান দৃষ্টান্ত যেন হয়। অনর্থক রাগ এবং ক্রোধ যেন আদৌ না থাকে। তিনি বলেন যে, আমি দেখেছি জামাতের বেশিরভাগ সদস্যদের মাঝে এখনো রাগের ব্যাধি রয়েছে। ছোট ছোট বিষয়ে হিংসা বিদ্বেষ মাথাচাড়া দেয় এবং পরস্পর ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ করে দেয়। এমন লোকদের জামাতের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। তিনি বলেন যে, আমার মতে এতে কি অসুবিধা যে কেউ যদি গালি দেয় তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি চুপ থাকবে এবংকোন উত্তর দিবে না? প্রত্যেক জামাতের সংশোধন প্রথমে নৈতিক গুণাবলীর মাধ্যমে আরম্ভ হয়। অতএব প্রথমে ধৈর্যের মাধ্যমে তরবিয়তের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া উচিত। আর সবচেয়ে উন্নত রীতি হলো, কেউ দুর্ব্যবহার করলে তার জন্য বেদনাঘন হৃদয়ে দোয়া করা উচিত। মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেন এসব মানদন্ডে উপনীত হতে পারি। (আমীন)

**Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 23rd Sep, 2016**

**BOOK POST (PRINTED MATTER)**

**To** .....

.....

**From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B**